Heritage of the past and HARVEST OF THE PRESENT

স্বাধীনতা আন্দোলন ও বঙ্গবাসী কলেজ

সুদেবভূষণ ঘোষ—প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী কলেজ

দীর্ঘ একশো বছরের পরাধীনতার গ্লানি ও সেই সঙ্গে ইংরেজ সরকারের অত্যাচার ও শোষণ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে করে তুলেছিল চরম নৈরাশ্যজনক। দৈব আশীর্বাদের মত সেই সময়ে বেশ কিছু মানুষের জন্ম হয় যাঁদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্মকাণ্ড বাঙালী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বয়ে নিয়ে আসে এক নবজাগরণের ঢেউ এবং সেই নবজাগরণের যুগের অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য গিরিশচন্দ্র।

বর্ধমান জেলার দামোদরের তীরের বেরুগ্রাম নামের একটি ছোট্ট গ্রামে গিরিশচন্দ্রের জন্ম হলেও বাংলার নবজাগরণের প্রথম ঢেউয়ের প্রভাব তাঁর উপর পড়তে আরম্ভ করে বাল্যকাল থেকেই। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র প্রভৃতি নবজাগরণের পথিকৃৎ-নায়কদের প্রভাব তাঁর সংবেদনশীল মনে স্বাভাবিকভাবেই ছাপ ফেলেছিল। অন্যদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের Indian Association for the Cultivation of Science-এর শুরু, বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের সংগঠন British Indian Association-এর সৃষ্টি—এই ধরণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাংলাদেশের সামাজিক মানচিত্রকে রাঙিয়ে তুলছিল। আবার সিপাহী বিদ্রোহ রচনা করল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের শৈশব এবং বাল্যকাল গড়ে উঠেছিল যে প্রেক্ষাপটে তার প্রতিবিম্বিত রূপ আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনকর্মের প্রতিটি স্তরে— তাঁর

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি অনুচ্ছেদে। কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের কোন একটি উক্তির প্রতিবাদে সেখানকার অধ্যাপনার চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া যুবক গিরিশচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি নিদর্শন মাত্র। দু-বছর বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরলেন গিরিশচন্দ্র এবং সঙ্গে নিয়ে এলেন এক সুগভীর জাতীয়তাবোধ আর নিজের দেশের মানুষের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করার এক দৃঢ় সংকল্প।

গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষাবিস্তার করে দেশের মানুষের চেতনার উন্মেষ না হলে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙা যাবে না। বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ এবং তার জন্য দেশের মানুষের যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে—তার চেহারা গিরিশচন্দ্রের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টাই হয়ে দাঁড়ালো তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

১৮৮৫ সালে দেশে ফিরে বৃটিশ সরকারের এবং হায়দ্রাবাদের নিজামের লোভনীয় দুটি চাকরীর আমন্ত্রণ হেলায় প্রত্যাখ্যান করে গিরিশচন্দ্র বৌবাজারে একটি স্কুল স্থাপন করলেন। সাধারণ পাঠক্রমের সঙ্গে একটি কৃষিবিদ্যার পাঠক্রম শুরু করার পরিকল্পনা নিলেন তিনি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কৃষিবিদ্যা শিক্ষণ এবং তার বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়। স্কুল স্থাপনের দু-বছর পরই গিরিশচন্দ্র বঙ্গবাসী কলেজ স্থাপন করেন।

কিন্তু বৃটিশ সরকারের চিরাচরিত দমননীতির ফলে কৃষিবিদ্যার পাঠক্রম চালু করা গিরিশচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই অবস্থায় ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনের দিকে নজর রেখে গিরিশচন্দ্র তাঁর ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটিকে পরিচালনা করতে লাগলেন। বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজ হয়ে দাঁড়ালো মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের আদর্শ প্রতিষ্ঠান। বঙ্গবাসী কলেজের অধিকাংশ ছাত্র আসতো

গ্রাম বাংলা থেকে। এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদর্শের মূলমন্ত্র প্রচারিত হতে লাগল।

গিরিশচন্দ্রের আর একটি মন্ত্রও বঙ্গবাসী কলেজ প্রচার করেছিল এবং তা হ'ল গভীর দেশাত্মবোধ। কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক ও ছাত্র ছিলেন রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ বিদ্বেষী—যার ফলে কলেজের ওপর বৃটিশ সরকারের রোষও ছিল চরম পর্যায়ে। সরকারের কাছ থেকে কলেজ কোন রকম আর্থিক সাহায্য পেত না এবং ছাত্রদের কাছ থেকে মাইনে বাবদ আয়ও ছিল অতি অল্প। সুতরাং অধ্যাপকদের মাইনে ছিল যৎসামান্য—কিন্তু তাঁদের উদ্দীপিত করতো আচার্যদেব ও তাঁর আদর্শ। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে তাই মনে হয় বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং তার প্রতিষ্ঠাতা যেন এক রূপকথা আর তার নায়ক।

সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আচার্য নিজেকে কখনও জড়িয়ে ফেলেননি; যদিও যে বছর তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন সেই বছরই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। তথাপি গিরিশচন্দ্রের প্রেরণায় বঙ্গবাসী কলেজ প্রথম থেকেই হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের পীঠস্থান।

কলকাতার অন্য সব কলেজ যখন সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মুক্তি-পাওয়া-শিক্ষা-পেতে-ইচ্ছুক যুবক রাজবন্দীদের ভর্তি করতে অস্বীকার করতো, আচার্য তাঁদের দু-হাত বাড়িয়ে নিজের কলেজে নিয়ে নিতেন। বিখ্যাত ওটেন-ঘটনার পর সুভাষচন্দ্রকে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হল—তিনি আচার্যের কাছে ভর্তির ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আসেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে অনার্স না থাকায় গিরিশচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে বঙ্গবাসীতে নিতে পারেননি। স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যক্ষকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর কাছে পাঠান এবং সুভাষচন্দ্র

স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে যান। রাজনৈতিক কারণে সরকারী কলেজের বরখাস্ত অধ্যাপকরাও বঙ্গবাসী কলেজে চাকরি পেয়েছেন আচার্যর নির্দেশে। এই সব কারণে বঙ্গবাসী কলেজকে National College হিসেবে সকলে মনে করতেন।

১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গভঙ্গের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ গিরিশচন্দ্র কলেজ বন্ধের লিখিত নোটিশ জারী করেন। এক ইংরেজ অধ্যাপক প্রঃ হুইলারের ক্লাস চালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে আচার্য নিজে ক্লাসে এসে সেই অধ্যাপককে তিরস্কার করেন এবং তখনই ক্লাস বন্ধ করার নির্দেশ দেন। সেই সময়ে এই ঘটনাটি বহু আলোচিত হয় এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

অগ্নিযুগের এক নায়ক অরবিন্দ ঘোষ এবং তাঁর ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্র ছিলেন গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর সহধর্মিনী নীরোদমোহিনীর খুব কাছের মানুষ। দুই ভাই প্রায়ই গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে আসতেন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা এবং আচার্যের পরামর্শ নেবার জন্য। ঐ বাড়ি থেকেই গিরিশচন্দ্র তাঁর বাল্যবন্ধু ভূপাল বসুর কন্যা মৃণালিনীর সঙ্গে অরবিন্দর বিবাহ দেন। মুরারীপুকুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত অরবিন্দ যেদিন বেকসুর মুক্তি পান সেদিন আলিপুর জেল থেকে গিরিশচন্দ্রই গিয়েছিলেন তাঁকে নিয়ে আসতে।

ঐ সময়ে বাংলার বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী ছাত্রদের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল বঙ্গবাসী কলেজ। কলেজের ছাত্রাবাসগুলিতে থাকতেন বহু বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ছাত্ররা এবং সেখানে চলত বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সদস্যদের আসা-যাওয়া, শলাপরামর্শ এবং গোপন বৈঠক। আচার্যর গোচরেই এ সব কিছু হত এবং এতে থাকতো তাঁর পূর্ণ সমর্থন।

বঙ্গবাসী কলেজের রসায়ন বিভাগের কিংবদন্তী অধ্যাপক লাডলী মোহন মিত্র ছিলেন অনুশীলন সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য। তাঁরই

এক সহযোগী শ্রদ্ধেয় জীবনতারা হালদারের কাছে সেই সময়কার বেশ কিছু ঘটনার কথা শুনেছি। বিপ্লবীদের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র যোগাড় করার জন্য প্রয়োজন হত বেশ কিছু অর্থের এবং তার একটি বড় পরিমাণ আসতো স্বদেশী ডাকাতির মাধ্যমে। অর্থোপার্জনও হত দানের মাধ্যমে। একবার অনুশীলন সমিতির তিন সদস্য অধ্যাপক মিত্র, জীবনতারা এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেলেন গুরুদেবের কাছে (১৯০৪/১৯০৫) সমিতির জন্য কিছু সাহায্যের আশায়। গুরুদেব অর্থের বদলে সেই সময়ে তাঁদের কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান রচনা করে দেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকেই বঙ্গবাসী কলেজ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সন্ত্রাসবাদী ছাত্রদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াল—১৯১০/১১ সালে এই কলেজে ও কলেজের ছাত্রাবাসে বিপ্লবী ছাত্রদের গোপন বৈঠকে সন্ত্রাসবাদের কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি ঠিক করা হ'ত—বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র বিপ্লবী পূর্ণদাস ও তার সহকর্মী যতীন মুখুজ্জে (বাঘা যতীন), মানবেন্দ্রনাথ রায় (M. N. Roy), জীবনতারা হালদার প্রভৃতি আরো অনেক বিপ্লবী ছাত্র ঐ গোপন বৈঠকে যোগ দিতেন। এখন এই সব কথা ভাবলে সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়।

১৯২০ দশকের প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে বাংলা সহ সারা ভারত যখন একটা নূতন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বেলিত সেই সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দও সেই আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন—বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছাত্র ঐ সময়ে কলেজে পড়াশুনা ছেড়ে দলে দলে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাবরণ করেন—সুভাষচন্দ্র সেই সময়ে মহাত্মাজী ও চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে যোগ দেন ঐ আন্দোলনে—১৯২৫ সালে হঠাৎ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলার নেতৃত্বে আসেন সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—১৯২৮ সালে কলকাতার পার্কসার্কাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়—সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ—G.O.C. এবং তার দুজন অন্যতম

সহ-স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের দুজন ছাত্র যতীন দাস ও প্রমোদ ঘোষাল। এ ছাড়া বঙ্গবাসী কলেজের আরো বহু ছাত্র ছিলেন স্বেচ্ছাসেবকের দলে। এই সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রসভাতে ভাষণ দিয়েছিলেন জহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। এই সভা হয়েছিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে—তখন কলেজ ছাত্র সংসদের সম্পাদক ছিলেন বিপ্লবী প্রমোদ ঘোষাল। এর কিছুদিন আগে লাহোরে লালা লাজপাত রায়কে যে পুলিশ অফিসার লাঠির আঘাতে জখম করেছিল এবং যার ফলে কয়েকদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়, সেই পুলিশ অফিসারকে বীর ভকৎ সিং হত্যা করে প্রতিশোধ নেন। তারপর তিনি কলকাতায় পালিয়ে এসে যতীন দাসের সঙ্গে মিলিত হন। এখানে কিছুদিন থাকার পর ওঁরা দুজনে আগ্রায় একটি বিপ্লবী আড্ডায় চলে আসেন, উন্নত ধরনের বোমা তৈরী করার ও অন্যান্য বিপ্লবীদের বোমা তৈরী শেখানোর জন্য। এর পরের বছর ১৯২১ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লীর সংসদ ভবনে যে বোমাটি ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ফেলেছিলেন সেটি যতীন দাসেরই হাতে তৈরী। বোমাটির ভেতর কোন লোহার টুকরা বা ঐ জাতীয় কোন দ্রব্যই ছিল না। কারণ কাউকে হত্যা করা বা জখম করা ঐ বোমা ফেলার উদ্দেশ্য ছিল না—কেউ আহতও হননি। উদ্দেশ্য ছিল একটা প্রচণ্ড আওয়াজ করে প্রতিবাদ জানান। কিসের প্রতিবাদ? ঐ দিন সংসদ ভবনে 'Public Safety Bill' নামে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে কোন আন্দোলন বন্ধ করার জন্য Billটি পাশ করানোর বিরুদ্ধে এবং বৃটিশ সরকারের একটি Commission-এর ভারতে আগমনের প্রতিবাদে (Simon Commission-এর Chairman Mr. Simon ও অন্যান্য সভ্যরাও ঐ দিন সংসদ ভবনে উপস্থিত ছিলেন)। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত সংসদ ভবনের দোতালার উপর থেকে পিস্তল থেকে প্রথমে ২/৩ বার ফাঁকা আওয়াজ করেন, তারপর বোমাটি ফেলেন—ভীষণ ধোঁয়ায় হলটি ভরে যায়। সকলেই পালাবার জন্য ছুটোছুটি করতে থাকেন—এই সময় ওঁরা দু'জনে সহজেই পালিয়ে আসতে পারতেন—কিন্তু ওঁরা দু'জনই

পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইচ্ছে করেই পুলিশের হাতে ধরা দিলেন—কারণ বিচারের সময় বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেশবাসীকে জানাতে পারবেন। এখানে একটি কথা বলে রাখি। আমার এক প্রাক্তন ছাত্র পিনাকি দত্ত আমাকে জানালেন বর্ধমানের ছেলে ঐ বটুকেশ্বর দত্ত বঙ্গবাসী কলেজেরই ছাত্র ছিলেন—এটা আমার কিন্তু জানা ছিল না।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সারা দেশের সঙ্গে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র-অধ্যাপক-কর্মী ও তাঁদের ঐতিহ্য অনুযায়ী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কলেজ গেটে প্রায়ই চলত পিকেটিং এবং সমগ্র ব্যাপারটা তদারকী করতে দেখেছি অধ্যাপক লাডলীমোহন মিত্র, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন অধ্যাপককে। পুলিশের অত্যাচার ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু কলেজের ভেতর পুলিশ ঢুকে পড়লে প্রবল বাধার সামনে পড়তো তারা। গিরিশচন্দ্র নিজে তাঁর ঘর থেকে নেমে এসে জানিয়ে দিতেন—কলেজের মধ্যে তাদের কোন এক্তিয়ার নেই—সকল দায়িত্বই তাঁর। নতমস্তকে রাগে গজগজ করতে করতে পুলিশ কলেজ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হত। প্রায়ই কলেজের দু-চার জন ছাত্রকে পুলিশ বন্দী করে নিয়ে যেত আর তাদের আদালত থেকে ছাড়িয়ে আনতে যেতেন লাডলীমোহন। সেই জন্য বোধ হয় লাডলীমোহনের কলেজের পোষাক ছিল কালো গলাবন্ধ কোট ও সাদা প্যাণ্ট।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আচার্যর নাম খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি কখনই যোগ দেননি, যদিও তাঁর মানসপ্রতিম প্রতিষ্ঠান বঙ্গবাসী কলেজ হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের মুক্তিকামী বিপ্লবী যুবকদের কাছে এক মাত্র স্বদেশী প্রতিষ্ঠান। আচার্য তাঁর বিদ্যায়তনকে করে তুলেছিলেন নির্যাতিত ছাত্রদের আশ্রয়স্থল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছেন, "আজও মনে পড়ে কি সাহসিকতার সহিত তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন

যে রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত ছাত্ররা তাঁহার বিদ্যায়তনে ভর্তি হইলে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন"।

আজ লিখতে বসে নানান ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে যা এই যুগে গল্পের মত মনে হতে পারে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবাসী কলেজের অবদানের পূর্ণ মূল্যায়ন আজও হয়নি। আশা করি আগামী প্রজন্মের কোন উৎসুক গবেষক এই বিষয়টিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করতে সক্ষম হবেন।

২

বঙ্গবাসী কলেজের যে অগণিত ছাত্র-অধ্যাপক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনের সম্পর্কে আমার জানা কিছু তথ্যের ভিত্তিতে এখানে সংক্ষেপে বলবো।

পূর্ণচন্দ্র দাস ঃ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে বহু ছাত্র ও যুবক সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত হন। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এই ব্যাপারে অগ্রগণ্য ছিলেন বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র। ১৯১০ সালে তিনি কলেজের ছাত্র ছিলেন। বাঘা যতীন, মানবেন্দ্রনাথ (M. N. Roy), জীবনতারা প্রভৃতি ব্যক্তিত্বরা ছিলেন পূর্ণচন্দ্রের সহকর্মী। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রাবাসে ঐ সমস্ত বিপ্লবী যুবকদের অনেক গোপন বৈঠক বসত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পূর্ণচন্দ্র স্বদেশী ডাকাতি করার সময় এক ইংরেজের পিস্তল ছিনিয়ে নিতে গিয়ে ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হন। কয়েক বছর পর মুক্তি পেয়ে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ১৯২৮ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবী দলে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে আবার কারাবরণ করেন। মুক্তি পাবার পর ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন এবং আবার কারারুদ্ধ হন। তাঁর কর্মজীবন শেষ হয় অধুনা বাংলাদেশের মাদারীপুরে।

মৃণালকান্তি বসু ঃ ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথপ্রদর্শকদের মধ্যে মৃণালকান্তি ছিলেন অগ্রণী। বঙ্গবাসী কলেজে গিরিশচন্দ্রের প্রথম যুগের ছাত্র ছিলেন তিনি। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন। **M.A.** পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বম্বেতে অনুষ্ঠিত ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সাংবাদিক হিসাবেও মৃণালকান্তি তাঁর অবদান রেখে গেছেন অমৃতবাজার পত্রিকার সহসম্পাদক হিসেবে।

মুজাফ্‌ফর আহমেদ ঃ ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের জনক মুজাফ্‌ফর আহমেদ, যিনি কাকাবাবু নামে সকলের কাছে পরিচিত, ১৯১০ সালে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং প্রথম যৌবনে সন্ত্রাসবাদে ছিলেন বিশ্বাসী। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি মার্কসীয় বই-পত্রের সঙ্গে পরিচিত হন এবং মার্কসীয় দর্শনে নিজের ব্যক্তিত্বকে পুষ্ট করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য থাকাকালীন তিনি বিপ্লবীভাবাপন্ন একদল ছেলেদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং এর থেকেই জন্ম হয় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি প্রথম কারাবরণ করেন।

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ঃ খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি ও চিকিৎসক কালীকিঙ্কর ছাত্রাবস্থা থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯১১-১২ সালে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন। **Indian Medical Association**-এর সভাপতি হয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধরেছিলেন। তাঁর একটি কবিতার বই ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে।

সতীশ সামন্ত ঃ ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময়ে মেদিনীপুরের তমলুকে যে ঘটনা ঘটেছিল তা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ইংরেজ রাজত্বে প্রথম স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত

হয় ঐ তমলুকে। ঐ সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের ১৯১৯-২১ সালের ছাত্র সতীশ সামন্ত। ঐ সময়ে ১৫ দিন তমলুক থানা এলাকায় ইংরেজ সরকারের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। শেষে সেনাবাহিনীর সাহায্যে ইংরেজ সরকার তমলুকের দখল নেয়। নারী, শিশু, পুরুষের উপর নির্বিচারে ইংরেজেরা দানবীয় অত্যাচার চালায় এবং তার ফলে মৃত্যু হয় বহু মানুষের। মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সতীশ সামন্ত স্বাধীন ভারতের Constituent Assembly-র সভ্য ছিলেন এবং প্রথম লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হন।

বসন্ত দাস ঃ সতীশ সামন্তের সমসাময়িক কালের ছাত্র ছিলেন মেদিনীপুরের বসন্ত দাস। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি মেদিনীপুর জিলা কংগ্রেস-এর সম্পাদক ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সহ সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনের নেতা হিসাবে তিনি বহুবার কারাবন্দী হন। দেশ স্বাধীন হবার পর বসন্ত দাস Constituent Assembly-র প্রথম লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হন।

সুশীলকুমার ব্যানার্জি ঃ হাওড়া জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও স্বাধীনতার পর পঃ বঙ্গের প্রথম কংগ্রেস সরকারে সংসদীয় সচিব সুশীল কুমার ১৯২০ সালে বঙ্গবাসী কলেজে পড়াকালীন কারারুদ্ধ হন। এরপর আবার ১৯৩১ সালে ও ১৯৪২ সালে কারারুদ্ধ হন।

দেবেন দে ঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়ে বিধান সভার প্রথম মুখ্য সচেতক দেবেন দে বঙ্গবাসী কলেজের বিশ দশকের প্রথম দিকের ছাত্র। ঐ সময়ে তিনি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মধ্য কলকাতায় নেবুতলা পোষ্ট অফিসে স্বদেশী ডাকাতি হয় দেবেন দে'র পরিচালনায়। পুলিশ দেবেন দেকে গ্রেপ্তার করার জন্য বিপ্লবীদের বিভিন্ন আস্তানায় হানা দেয়।

অন্য দিকে দেবেন দে তখন ছদ্মবেশে খিদিরপুর ডকে জাহাজে কুলীর কাজ করছেন। সিঙ্গাপুরের জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তিনি সিঙ্গাপুরে পাড়ি দেন। সেখান থেকে তাইল্যাণ্ড ও আরো কয়েকটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে গিয়ে নানান যোগাযোগ স্থাপন করেন। কলকাতার বিপ্লবীদের জন্য তিনি ঐ সব দেশ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পাঠাতে থাকেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি ফিরে আসেন এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ইণ্টালী কেন্দ্র থেকে বিধান সভায় নির্বাচিত হন এবং মুখ্য সচেতকের পদ গ্রহণ করেন। কয়েক বছর পর একটি মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রমোদ ঘোষাল ঃ বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন ১৯২৪-২৮ সালে। ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেন। শহীদ যতীন দাসও ঐ সময়ে বঙ্গবাসী কলেজে পড়তেন। একবছর ঐ সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র সংসদের সভাপতি ছিলেন শহীদ যতীন দাস ও তার সম্পাদক ছিলেন বিপ্লবী প্রমোদ ঘোষাল। ঐ সময় সারা বাংলারও প্রথম ছাত্র সংগঠন Bengal Provincial Students' Association (B.P.S.A.)—এরও প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রমোদ ঘোষাল। ১৯২৮ সালে All India Students' Association (A.B.S.A.) নামে ভারতের প্রথম ছাত্র সংগঠন তৈরী হয় এই কলকাতায়—এবং তার প্রথম সম্পাদক হয়েছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র প্রমোদ ঘোষাল। এই ছাত্র সংসদের প্রথম অধিবেশন হয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে পণ্ডিত জহরলালের সভাপতিত্বে ও সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতে। ঐ সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র সভায়ও ভাষণ দিতে আসেন জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। সেই সভাটিও হয়েছিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে।

ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য ঃ বিপিনবিহারীর আর এক শিষ্য ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য ১৯২৬ সালে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। বঙ্গবাসী স্কুলে পড়ার সময়েই

তিনি ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ নেন এবং নেতৃত্বে আসেন। কলেজের ছাত্রাবস্থায় তিনি কংগ্রেসের যুব আন্দোলনে অংশ নেন এবং কারারুদ্ধ হন। ক্রীড়া-সাংবাদিক হিসেবে পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত হন। Sports Journalist's Association- এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর ক্রীড়া সম্পাদক হন।

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বঙ্গবাসী কলেজে I. Sc. ক্লাসে পড়াকালীন ছাত্র আন্দোলনের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান। A.B.S.A ও B.P.S.A-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোবিন্দলাল। ডালহৌসী স্কোয়ারের বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩০-৩৮ কারাবাস করেন। এরপর ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ সাল আবার কারান্তরালে কাটান। কারারুদ্ধ অবস্থায় বি,এ, এম,এ ও বি-এল পরীক্ষা পাশ করেন। স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্থানে পূর্ব বাংলা কংগ্রেস দলের মূখ্য সচেতক হন। এরপর পঃ বাংলায় ফিরে আসেন ও বিধান সভার সহ সচেতক হয়েছিলেন।

অমূল্য সেনঃ বঙ্গবাসী কলেজে বি-এ ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় কারাবাস করেন।

অমর নন্দীঃ বঙ্গবাসী কলেজের আই-এসসি ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। ১৯৩০ এবং ১৯৪২-এ কারারুদ্ধ হন।

চিত্তরঞ্জন দাশঃ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই-এ পাশ করেন এবং ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য কারারুদ্ধ হন এবং জেল থেকেই বি-এ পাশ করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলির পরিদর্শক হন।

দুর্গা চট্টোপাধ্যায়ঃ ১৯১৬ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পাশ করেন এবং বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯২০

এবং ১৯৪২-এ কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহ প্রচারের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা করেন কলকাতা থেকে কাশী।

কালীপদ মুখোপাধ্যায় ঃ ১৯৩৩ সালের বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই সময়ে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। কলেজে পড়ার শেষে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামী যুবক বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন ও বহুবার কারাবরণ করেন। স্বাধীনতার পর এঁর নেতৃত্বে বেঙ্গল ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রধান হয়েই ছিলেন।

হরেকৃষ্ণ কোঙার ঃ সারা ভারতবর্ষে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হরেকৃষ্ণ কোঙার ১৯৩২ সালে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩০ সালে স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন কংগ্রেসের ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। কলেজে পড়ার সময়ে তিনি আবার গ্রেপ্তার হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। আন্দামানে অন্তরীণ অবস্থায় কয়েকজন কমিউনিষ্ট নেতার সংস্পর্শে এসে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন। আন্দামান থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। কৃষক সংগঠন ছিল তাঁর প্রধান কাজ। জমিদার জোতদারদের জমি দখল করে ভূমিহীন কৃষকদের ঐ জমি বণ্টন তিনিই শুরু করেন।

দ্বিজেন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ ১৯৩৩ সালে বঙ্গবাসী কলেজে আই-এসসিতে ভর্তি হয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং ১৯৩৪ সালে গ্রেপ্তার হন। ছাড়া পাবার পর টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় আবার গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পাবার পর বি-এ ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯৩৫ সালে আবার গ্রেপ্তার হন। কিছুদিন পর মুক্তি পেয়ে ১৯৩৬ সালে টিটাগড় মামলায় আবার গ্রেপ্তার হন। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই বি-এ, এম-এ, বি-কম, এম-কম পরীক্ষা দেন। সুভাষচন্দ্রের অনুগামী তিনি প্রথম থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য

ছিলেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় তিনি ভারতীয় রেলের প্রচুর ক্ষতিসাধন করেন এবং ৪৩ সালে আবার গ্রেপ্তার হন। স্বাধীনতার পর কৃষক প্রজা পার্টি'র সক্রিয় কর্মী হন এবং বিধান পরিষদের নির্দল সদস্য হন। প্রায় বারো বছর রাজ্যসভার সভ্য ছিলেন।

দেবতোষ দাশগুপ্ত ঃ চল্লিশ দশকে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে যখন সাম্প্রদায়িক আগুন সারা কলকাতা ভস্মীভূত হতে চলেছে মহাত্মা এসে শান্তির বাণী শোনালেন এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আহ্বান করলেন আগ্নেয়াস্ত্র সমর্পণের জন্য। দেবতোষের নেতৃত্বে সেদিন দলে দলে যুবকরা এসে সেই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার শপথ নেয়। মহাত্মাকে দেবতোষ অনুরোধ করেন একটি বাণী লিখে দেবার জন্য। মহাত্মা সেদিন যে বাণীটি লিখে দেন তা আজ সারা পৃথিবীতে প্রচারিত—"আমার জীবনই আমার বাণী"।

অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঃ ছাত্র দরদী অধ্যাপকের মূর্ত প্রতীক ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। হাজার হাজার ছাত্রকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করতে তিনি ছাত্রদের সমান অনুপ্রেরনা দিতেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার জন্য বিভিন্ন জেলায় তাঁকে ছাত্র ও শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে হত। ১৯২৯ সালের ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের সভাপতি হন। এছাড়া ২৪ পরগণার শিক্ষক সম্মেলনেরও সভাপতি হন।

অধ্যাপক লাডলীমোহন মিত্র ঃ রসায়নশাস্ত্রের কিংবদন্তী অধ্যাপক লাডলীমোহন অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তারপর থেকে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের সকল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি ছিলেন এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক। রাজনৈতিক কারণে যে সব ছাত্ররা গ্রেপ্তার হতেন তাঁদের সকল মামলা বিনা খরচে তিনি নিজে চালাতেন।

অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী ঃ ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী (যাঁর নামে স্কটলেনের নাম পরিবর্তিত হয়েছে) নোয়াখালি জেলার সন্দীপ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বঙ্গবাসী কলেজের আর এক কিংবদন্তী ছাত্র-দরদী অধ্যাপক হিসাবে তিনি পরিচিত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বহুবার কারাবরণ করেন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে সেখানকার Constituent Assembly-র সদস্য হন। পরে ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে শিক্ষক প্রতিনিধি হয়ে বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সদস্য হন। শিক্ষক আন্দোলনের অগ্রগণ্য এই নেতা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিক সমিতির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর সারাটা জীবন কেটেছে সমাজ সেবায়। অবসর গ্রহণের পর তিনি বঙ্গবাসী কলেজে বছরে এক টাকা বেতন নিয়ে অধ্যাপনা করে গেছেন। আমরা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ তাঁর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করি কলেজের কমন-রুমে। কলেজের কাছেই একটা মেসে ছোট্ট একটি ঘরে তিনি জীবনের শেষ ৫০ বছর অতি সাদাসিদে ভাবে কাটিয়ে গেছেন। সারা জীবনে শিক্ষকতা করে যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন সেটা সবই দান করে গেছেন—বেশীর ভাগ (এক লক্ষ টাকার উপর) রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে—বাকী রহড়া বিবেকানন্দ কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অধ্যাপক নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজীর অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ তাঁর চাকরী হারান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য হবার কারনে। গিরিশচন্দ্র তাঁকে ১৯২৬ সালে বঙ্গবাসী কলেজে নিযুক্ত করেন সরকারের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র সংসদের প্রথম সংবিধান তৈরী হয় তাঁরই নির্দেশনায়। গান্ধীবাদী এই অধ্যাপক বহুবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

অধ্যাপক তিনকড়ি দে : বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র থাকার সময়েই

স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত থাকায় বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার হন। তিনি রাসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি ঃ অর্থনীতির বিখ্যাত অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ ১৯১৩ সাল থেকে ৩১ বছর বঙ্গবাসী কলেজ অধ্যাপনার কাজ করেছেন। বঙ্গবাসী কলেজে Economic Association-র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি ছিলেন তিনি। অধ্যাপক ছাড়াও দেবেনবাবু ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ও সমাজ সেবক। তিনি বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ও পরে সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। কলিকাতা পৌর সভার মেয়র নির্বাচিত হন ১৯৪০-এর দশকে। ১৯৪৩ সালে কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক মুকুন্দলাল চক্রবর্ত্তি ঃ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পাশ করে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতি করতেন এবং বহুবার কারারুদ্ধ হন। তাঁর অনুজ ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তিও ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র।

অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্মণ ঃ বঙ্গবাসী কলেজের বিশ দশকের ছাত্র দেবাজ্যেতি বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "যুগবাণী"-র সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতি করতেন এবং সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নবজ্যোতি ছিলেন তাঁর ভাই এবং বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র। দুজনেই বহুবার কারাবাস করেছেন।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ঃ দর্শন শাস্ত্রের খ্যাতিমান অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন বামরাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ এবং প্রসিদ্ধির জন্য কোন কলেজ তাঁকে চাকরী দিতে চায়নি। গিরিশচন্দ্র

তাঁকে ১৯৩৬ সালে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করেন। ১৯৪৫ সালে হঠাৎ তিনি পরলোক গমন করেন।

এ ছাড়া আরো অনেক বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। আশা করি পরিশ্রমী গবেষক এঁদের বিস্মৃতির ধূলা থেকে উদ্ধার করে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবেন।